তারা চাইলেই তো বাঙালির সব চাওয়া হয়ে যায়!

মিলান ফারাবী

এক. ঘরের ব্যাপার পরের হাতে

বাংলার জনগণের আবার চাওয়া পাওয়া কি! আসলে তারা চাইলেই তো বাংলার মানুষের চাওয়া হয়ে যায়। কষ্ট করে মানুষ আবার চাইতে যাবে কেন? তারাই তো যথেষ্ট। তারা যে বাংলার মানুষের হয়ে তকলিফ করে, বড় অনুগ্রহ করে চাইতে গেছেন, এতেই তো বাঙালির ধন্য হয়ে যাওয়া উচিত। সবচেয়ে বড় সত্যি হচ্ছে- এটাই এখন রাজনীতিতে চলছে। দেশের মানুষের পক্ষে নেতা-নেত্রীরাই তো যা চাইবার চেয়ে দেন। নেতা কিংবা নেত্রী চেয়েছেন, সুতরাং আমাদের ধরে নিতে হবে; মেনে নিতে হবে দেশবাসীও পেয়েছেন। নেতানেত্রীরা বিলাসবহুল গাড়ি, বাড়ি, প্লট পেয়েছেন। ব্যবসা বাণিজ্যের কমিশন পেয়েছেন। অত্যাধুনিক ন্যামফ্লাটের বরাদ্দ পেয়েছেন। সুতরাং বাংলার মানুষের পাওয়াও হয়ে গেছে। নেতা-নেত্রীর চাওয়া মানে জনগণের প্রতীকী প্রত্যাশা। নেতা-নেত্রীর পাওয়া মানে জনগণের প্রতীকী প্রাপ্তি। আশাকরি, এই অর্বাচীন কথাগুলো কেউ অন্যভাবে নেবেন না। এই চাওয়া-চাওয়ির ব্যাপারে নাক গলানোর আগে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে আগাম একটা ধন্যবাদ জানিয়ে রাখতে চাই। না, ঘরের ব্যাপার এভাবে কেউই পরের হাতে ছেড়ে দেয় না। অথচ তিনি দিয়েছেন। তিনি দেশরত্ন। তাই তিনি দিয়েছেন। নতুবা তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় রাজনীতিতে আসবেন কি আসবেন না তার সিদ্ধান্ত তিনিই তো নিতে পারতেন। কিংবা তার স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়া নিতে পারতেন। যে যাই বলুক, এটা নিতান্ত পারিবারিক ইস্যুও বটে। কিন্তু এ রকম এক জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যু তিনি ঘরের মধ্যে, দলের মধ্যে আটকে রাখতে চাইছেন না। দেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের রথে চড়ে জয় দিগ্বিজয়ী সেকেন্দারের মতো বিজয় সূচনা করবেন; এমন স্বপ্ন স্বপ্ন মায়াঞ্জন মাখানো বিষয়টিও তিনি দিব্যি মানুষের হাতে সোপর্দ করেছেন। তাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। অবশ্য জয়ের রাজনীতিতে আসা, না আসা নিয়ে অনেকদিন ধরে আলোচনা চলছিল। দুর্জনদের মতে, এ নিয়ে যদ্দুর পারা যায় রাজনৈতিক ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হয়েছিল। জয়ের পলিটিক্যাল ক্যারিয়ারকে মসৃণ ও ক্যারিশম্যাটিক করার জন্য এই নাটকীয়তার চেষ্টা হতে পারে। ফিল্মে যেমন হয়। দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সেন্টিমেন্টাল ড্রামা, তারপর চূড়ান্ত ক্লাইম্যাক্স শেষে নায়কের নায়কোচিত ডায়ালগ; আমি আইছি। এইবার ডিপজলের রক্ষা নাই; কাহিনীর সেখানেই ইতি। নিন্দুকদের আশঙ্কা এক্ষেত্রেও তেমনটাই হচ্ছে বুঝি। আমেরিকায় কম্পিউটার প্রতিষ্ঠানে জব করছিলেন জয়। মার্কিন মুল্লুকে বিদেশিনী বধূকে নিয়ে সংসারধর্ম ভালই চলছিল। রাজনীতির স্বর্ণসম্ভাবনা তাকে হাতছানি দিচ্ছিল নিশ্চয়। কিন্তু বলা নেই, কওয়া নেই হুটহাট এমনভাবে তো আসা উচিত নয়- যাতে সবাই বলতে পারে- উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। বঙ্গবন্ধু-দৌহিত্র রংপুরের নন্দন। তার মা শেখ হাসিনার মনোভাবটা প্রথম প্রথম ঠিক আন্দাজ করা যায়নি। তিনি তো অনেকবারই বলেছেন- জয় রাজনীতিতে আসুক তিনি চান না। জয়ের রাজনীতিতে আসার ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়েছেন বেশ ক'বার। এবার অবশ্য অন্য সুর শুনছি। গত ১৯ ডিসেম্বর তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, বাংলার মানুষ চাইলেই জয় রাজনীতিতে আসবে। সে নিজের যোগ্যতাতেই রাজনীতিতে আসবে। আমি মা হিসেবে তাকে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করবো না।

তাকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। দারুণ একটা কথা বলেছেন। সম্ভবত জয়কে রংপুরের নন্দন পরিচয়েই রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা প্রার্থী হতে হচ্ছে। নিরপেক্ষতার ধ্বজা উপরে তুলে ধরতে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। মমতাময়ী মা বলে কথা। ছেলের ভালো কে না চায়। তাই ততোটা নিষ্ঠুর হননি হাসিনা। ভাগ্যিস তিনি বলেননি, জয় তার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠায় আওয়ামী লীগের প্লাটফরম ব্যবহারে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা পাবে না। ভাগ্যিস তিনি বলেননি জয়কে একজন তৃণমূল কর্মীর মতো লড়ে উঠে আসতে হবে। বঙ্গবন্ধু যেমন অজগাঁ গোপালগঞ্জ থেকে ক্রমশ উঠে এসেছিলেন জাতির শীর্ষে।

উঠতে না পারলে রংপুরের পীরগঞ্জে থানা সংগঠনেই থেকে যাবে জয়। মায়ের স্নেহকে উপেক্ষা করেননি শেখ হাসিনা। তেমনটা বললে সবচেয়ে বিপাকে পড়তো আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগ, যুবলীগ। জয়ের আগমন উপলক্ষে বিমানবন্দরে মহাসমারোহ তারা করেছে; ব্যান্ড বাজিয়েছে। শোভাযাত্রা করেছে। এমনকি গাড়ি ভাংচুরও করেছে। সে উদ্যোগ একেবারে মাঠে মারা যেতো। জয়কে নিয়ে সংবর্ধনা, কীর্তন ইত্যাদিও হবে আগামী দিনগুলোয়। শেখ হাসিনা সেখানে বাধা হলে বড্ড মুশকিল হতো। আওয়ামী রাজনীতির রাজপুত্রকে নিয়ে নেতা-কর্মীরা মাতোয়ারা হবে, সেটা খুবই স্বাভাবিক। এটা তাদের দল গণতান্ত্রিক অধিকার।

দুই. বিবাগী বানাইলো ওই মরার কোকিলে...

আচ্ছা, দলনেত্রী শেখ হাসিনা তো বলেই খালাস বাংলার মানুষ চাইলে জয় রাজনীতিতে আসবে। মহামুসিবত।। এখন আমরা কোন আলামত দেখে বুঝবো দেশের মানুষ জয়কে চাইছে কি চাইছে না। আমাদের কথা বাদ, আমরা তো নির্বোধ

পক্ষ। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাই বা কেমন করে বুঝবে। বাংলার মানুষের চাওয়া না চাওয়ার সঠিক হিসাব জানতে হলে তো গণভোট করা প্রয়োজন। গণভোটের কোন আয়োজন টায়োজন হচ্ছে কি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে না হয় তেমন কিছু একটা করা যেত। যেমনটি ঐকমত্যের আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে হয়েছিল। যায়যায়দিনের কল্যাণে আমরা প্রামাণ্য ভিজিটিং কার্ডসহ সবিস্তারে জেনেছিলাম- তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী-নন্দন জয় কিভাবে আমেরিকায় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বনে গেছেন। বাংলার মানুষের চাওয়া, না চাওয়ার তোয়াক্কা না করে, কোন ম্যান্ডেট না নিয়েই সেটা সম্ভব হয়েছিল। কেউ আপত্তির সাহস পায়নি। অবশ্য এর একটা ধুরন্ধর যুক্তি হিসেবে আমরা বলতে পারি, তৎকালীন বাংলার মানুষ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় চেয়েছিল। ম্যান্ডেট দিয়েছিল। সেই আওয়ামী লীগ, কিংবা তদীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী যখন চেয়েছেন; অবশ্যই তাতে বাংলার মানুষের চাওয়াটাও হয়ে গেছে। এটা বাংলার মানুষের চাওয়া পাওয়া বাস্তবায়নের শর্টকাট রাস্তা আর কি! উপদেষ্টা নিয়োগ, পরামর্শক নিয়োগ ইত্যাদি টুকটাক ব্যাপারে তো আর গণভোট দেয়া যায় না। কিন্তু এবার রাজার রাজনীতিতে আসা; আগামীতে সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রিত্বে আসা, আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্বে আসার মতো মহা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার দলটির সামনে। এটা ছেলেখেলা নয়। এ ব্যাপারে অবশ্যই বাংলার মানুষের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। কিন্তু উপায়টা কি! জননেত্রী শেখ হাসিনা কি কোন বিকল্প পথ ভাবছেন! জনমত যাচাই, জনমত সংগ্রহের কোন দেশব্যাপী উদ্যোগ নিয়েছে কি আওয়ামী লীগ! কর্মীরা কি লাখ লাখ প্রশ্নপত্র কিংবা মতামতপত্র হাতে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে! তাতে একটাই প্রশ্ন-জয়কে চান কি চান না। ব্যাপারটা কিন্তু মন্দ হয় না। অভিনব হবে। জনমন ভোলানোও হবে। তাছাড়া জনমত জরিপের ফলাফল ইচ্ছামতো আকাশ পাতাল করা যাবে। এখানে তো আর মরা কপাল কেয়ারটেকার সরকার নাক গলাতে আসবে না। কি একটা বাজে সিস্টেম! পছন্দমতো লোকের হাতে ক্ষমতা দিয়েও কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায় না। আওয়ামী লীগকে বিবাগী বানাইলো এই মরার কোকিলে। অথচ এই মরার কোকিল সরকার সিস্টেমকে আওয়ামী লীগ আন্দোলন করেই চালু করতে বাধ্য করেছিলো। এ ক্ষেত্রে কেয়ারটেকার ব্যবস্থা যেহেতু নেই তাই যেমন ইচ্ছে ফলাফল ঘোষণা করা যাবে। হাইকমান্ড যেমনটা চাইবে, তেমনটাই হবে। এ ছাড়া শর্টকাট পথও একটা আছে। সংবাদপত্রে অনলাইন প্রতিদিনকার জরিপ বিভাগে মতামত চাওয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে একটু সমস্যা আছে। আওয়ামী পন্থি পত্রিকাগুলো ‘পজেটিভ’; এন্টি পত্রিকাগুলো নেগেটিভ রেজাল্ট দিয়ে বসলে ব্যাপারটা বিতর্কিত হয়ে পড়তে পারে। নিরাপদ পন্থা হিসেবে কোন বিদেশী বাংলা রেডিও সার্ভিসের শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে। ইতিমধ্যেই প্রমাণ হয়েছে ওরা এ কাজে সিদ্ধহস্ত। বঙ্গবন্ধু পরিবারকে তারা নিরাশ করবে না। শ্রেষ্ঠ বাঙালির জরিপে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে দুই বাংলার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপাটি বঙ্গবন্ধুর করায়ত্ত তো আজ তাদের সৃজনশীল নৈপুণ্যদীপ্ত প্রতিভার কল্যাণেই।

৩. নেকলেস অলঙ্কার প্রসঙ্গ

এবার আমরা ইস্যুটি বামমার্গীয় কিংবা চিন্তা-চৈনিক যুক্তি ও বোধ বুদ্ধির আলোকে বিশ্লেষণ করতে পারি। সজীব ওয়াজেদ জয় রাজনীতিতে আসবে কি আসবে না; সে ব্যাপারে এখনই বাংলার মানুষ চাওয়া না চাওয়ার ঝামেলার মধ্যে যাবে কেন! জয় সাহেব যদি রাজনীতি করতে চান অতি অবশ্যই আসুক। এখন যৌবন যার, রাজনীতিতে আসার তার শ্রেষ্ঠ সময়। আওয়ামী লীগ, বামগোষ্ঠীর দলসমূহ কিংবা বিএনপি যেটিকে তার পছন্দ; সেটির মাঠ পর্যায়ে তিনি কোমর বেঁধে নেমে পড়ুন না। তারপর তার মেধা, যোগ্যতা, ক্যারিশমা গুণে তিনি জাতীয় পর্যায়ে আসবেন। যোগ্য হলে জাতির কর্ণধার হলেও কারও আপত্তির কিছু দেখি না। মাঠ রাজনীতির প্র্যাকটিসটা তিনি যে কোন বড় ছোট দলের কর্মী হয়েই করতে পারেন। এটা যে অতি অবশ্যি আওয়ামী লীগই যে হতে হবে এমন কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। আজকের আওয়ামী লীগের অনেক বাঘা নেতাই তো এক সময় ছাত্র ইউনিয়ন, কমিউনিস্ট পার্টি করতেন। বিএনপি’র অনেক নেতাই তো ন্যাপ বা বামদল থেকে রাজনৈতিক দীক্ষা নিয়ে এসেছেন। শেখ হাসিনা এমনটা বললেই বুঝি আরও ভাল লাগতো যে– জয়কে রাজনীতিতে আসতে হলে, কিংবা আওয়ামী লীগের মতো মস্ত দলের মস্ত নেতা হতে হলে মাঠ রাজনীতি শিখে আসতে হবে। উড়ে এসে জুড়ে বসলে চলবে না।

শেখ হাসিনার ‘বাংলার মানুষ চাইলে’ ডায়ালগের মূল মেসেজ নিশ্চয় তেমনই। আমরা মুখ্যসুখ্য মানুষ সঠিক অনুধাবন করতে পারিনি। আশা করা যায়, তার দলীয় ব্যাখ্যাজীবী, বুদ্ধিজীবীরা সহসাই এ ব্যাপারে মুখ খুলবেন। ইতিবাচক সুন্দর সুন্দর ব্যাখ্যা দেবেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দুর্জন অনেকে বলছেন, বাংলার মানুষের প্রসঙ্গ অনেক পরে। আগে জানা দরকার জয় রাজনীতি করতে চান কি না; আওয়ামী লীগের বর্তমান বাঘা নেতারা তাকে শীর্ষ আসনে বসাতে চান কি না। দলটির কর্মীরা উত্তরাধিকার রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে থাকতে চায়, নাকি ওই বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়- সবচেয়ে আগে এইসব দলীয় বিষয়ের ফয়সালা হওয়া প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে শেখ হাসিনা যখন আওয়ামী লীগের শীর্ষ পদে আসীন হয়েছিলেন তখন বঙ্গবন্ধু কন্যা পরিচয় ছাড়া তার কোন ঈর্ষণীয় রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ছিল না। বিজ্ঞানী পত্নী হয়ে সংসারধর্ম পালন করছিলেন। দলটির তৎকালীন নেতৃত্বের গভীর কোন্দলের অবসান ঘটাতেই আশির দশকের সূচনায় তাকে রাজনীতিতে টেনে আনা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু ও ৪ নেতাকে হারিয়ে দলটিও মারাত্মক দুরবস্থায় পড়েছিল। দলটি ইমেজ সঙ্কটে পড়েছিল। আওয়ামী লীগ কি এখন তেমন কোন ইমেজ সঙ্কটে পড়েছে! যোগ্য নেতৃত্বের সঙ্কট আছে কি দলটিতে! কোন্দল, হিংসা-স্যাবোটাজ কি দলের ভেতরে মারাত্মক আকারে ধারণ করেছে। ‘৩০ এপ্রিল’ ডেডলাইন মার্কা হাস্যকর মিসাইলে কি অর্ধশতাব্দী প্রাচীন এই রাজনৈতিক টাইটানিক ডুবতে বসেছে! যদি তা না হয় তবে আওয়ামী লীগের মতো বড় দলে উত্তরাধিকারের রাজনীতি নিয়ে এত টানাহেঁচড়া কেন! সজীব ওয়াজেদ জয় রাজনীতিতে আসবেন, অবশ্যই আসবেন। যেভাবে তার নানা কাদা-মাটি ভেঙে ক্রমান্বয়ে উঠে এসেছেন; সেভাবে একের পর এক সিঁড়ি ভেঙেই আশাই উত্তম।

রাজনীতিকদের উত্তরপুরুষ কখনওই রাজনীতিতে অবাঞ্ছিত নন; তবে এক্ষেত্রে মাতা, পিতা, নানা, দাদা ইত্যাদি পরিচয়ের নেকলেস, অলঙ্কার কিংবা বকলসগুলো গলা থেকে খুলে আসাই উত্তম। #